দর্প ফিকে

বেঙ্গল টাইমস

৮ জুন, ২০২৪

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

সম্পাদকীয়

জরুরি বার্তা

লোকসভা নির্বাচনের ফল কী হবে? আবার যে নরেন্দ্র মোদিই সরকার গড়ছেন, তা নিয়ে কোনও মহলেই তেমন সংশয় ছিল শুধু। শুধু দেখার ছিল, আসনসংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। আব কী বার চারশো পারের হুঙ্কার অনেকদিন ধরেই ভেসে বেড়াচ্ছিল। দেখা গেল, চারশো তো দূরের কথা, আড়াইশোও হল না। অর্থাৎ, আর বিজেপির এক সরকার নয়। ফিরে এল ‘এনডিএ’ শব্দটা। আসলে, সরকার বড় বেশি ‘আমিত্ব’ রোগে ভুগছিল। বিশেষ একজনের মহিমা প্রচারেই সবাই ব্যস্ত ছিলেন। সেই প্রচারের রঙ কিছুটা নিশ্চয় ফিকে হয়েছে।

তথাকথিত শক্তিশালী সরকার হয়তো হল না। বিজেপির পক্ষে নিশ্চিতভাবেই অস্বস্তির। কথায় কথায় চন্দ্রবাবু নাইডু বা নীতীশ কুমারের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। মাঝে মাঝেই তাঁরা বেঁকে বসবেন। ছোবল মারার ক্ষমতা না থাকুক, অস্তিত্ব জাহির করতে

মাঝেমাঝে ফোঁসটুকু করতে হবে। কথায় কথায় ‘মোদি সরকার’ বলা যাবে না। এও কি কম বিড়ম্বনার! তবে এই সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে এখনই তেমন সংশয় নেই। কারণ, এক শরিক চলে গেলে অন্য শরিক ঠিক জুটে যাবে। বিজেপি যেহেতু গরিষ্ঠতার কাছাকাছি, তাই তারাই চালিকাশক্তি।

তবে বিরোধীদের এই উত্থানটা গণতন্ত্রের স্বার্থেই জরুরি ছিল। নানা সময় ভুল বোঝাবুঝি বাড়বে, তিক্ততা বাড়বে, একে অন্যের ওপর চাপ তৈরির কৌশল থাকবে। তবু সম্মিলিত একটা বিরোধী কণ্ঠস্বর থাকাটাও জরুরি। গত দশবছর বিরোধীদের সংখ্যা কম ছিল বলেই শাসক সেই সংখ্যাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি। ক্যাবিনেটকে এড়িয়ে, সংসদকে এড়িয়ে একের পর এক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, সেই প্রবণতা এবার অনেকটাই কমবে। তাই সরকার যদি কিঞ্চিত নড়বড়ে হয়েও থাকে, দেশের পক্ষে সেটা শাপে বর হয়ে উঠতেই পারে।

বিরোধী শক্তিশালী মানেই গণতন্ত্রও শক্তিশালী

মলয় সেন

গত কয়েকমাস ধরে যাবতীয় আলোচনার কেন্দ্রে ছিল ভোট। লোকসভা ভোট মানে কারা কেন্দ্রে সরকার গড়বে, তা নির্ধারণ করার ভোট। কিন্তু সেই আলোচনা বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে তেমন গুরুত্ব পায়নি। কারণ, দেশে কারা ক্ষমতায় আসতে চলেছে, এই ছবিটা অনেকটাই পরিষ্কার ছিল। বড়জোর জল্পনা যেটুকু, তা হল, শাসকদলের আসন কোথায় গিয়ে পৌঁছবে? আগের থেকে অনেকটা বাড়বে? নাকি কমবে?

বাঙালির তর্কের অনেকটা অংশ জুড়ে ছিল রাজ্যে ক্ষমতা আর আসনের বিন্যাস নিয়ে। আগের লোকসভা ভোটে তৃণমূলের অনেকটাই শক্তিক্ষয় হয়েছিল। অনেককে

চমকে দিয়ে বিজেপি ১৮ আসন পেয়েছিল। এবার কি তাকেও ছাপিয়ে যাবে? নাকি তৃণমূল তার হারানো জনভিত্তি ফিরে পাবে? জনমত সমীক্ষায় অনেকেই এগিয়ে রেখেছিলেন বিজেপিকে। বাস-ট্রামের আলোচনাতেও মনে হচ্ছিল, জবরদস্ত টক্কর হতে চলেছে। কিন্তু একের পর এক ইভিএম খুলতেই দেখা গেল, বাংলা রেঙে উঠল সবুজ আবিরে। গেরুয়া ঝড় কেমন যেন ফিকে হতে লাগল। উত্তরবঙ্গে বিজেপি তাদের দাপট অনেকটাই ধরে রেখেছে। কিন্তু ধস নেমেছে দক্ষিণবঙ্গে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় এবারও তৃণমূলের নিরঙ্কুশ দাপট। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও কাজ করেছে তৃণমূল ম্যাজিক।

এই সাফল্যের রহস্য কী? সমাজবিজ্ঞানের গবেষকরা অনেক দিকেই আলো ফেলবেন। তবে নির্যাস ধরতে গেলে, ১) জেলা ও গ্রামাঞ্চলে এখনও মসৃণ সংগঠন। ২) লক্ষ্মীভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী-সহ বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প। যার সুফল পেয়েছেন কোটি কোটি মানুষ। ৩) বিরোধীদের না ছিল পাল্টা সংগঠন, না ছিল জোরালো প্রচার। ৪) বিকল্প হিসেবে বাম, কংগ্রেস জোট তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় যতটা সক্রিয়তা দেখা গেছে, বাস্তবে তা ছিল না। ৫) শাসকদলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির নানা অভিযোগ থাকলেও নিচুতলায় তার তেমন প্রভাব পড়েনি। ৬) তৃণমূলের প্রার্থী নির্বাচনে অন্যান্যবারের তুলনায় অনেক বেশি পরিকল্পনার ছাপ। এমন আরও অনেক কারণ চাইলে খোঁজাই যায়। মোদ্দা কথা, তৃণমূলকে টক্কর দেওয়ার মতো রাজনৈতিক শক্তি এখনও তৈরি হয়নি।

অন্যদিকে, জাতীয় ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদির দাপট যেন অনেকটাই ফিকে। বিজেপি এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল না। নির্ভর করতে হবে শরিকদের ওপর। পাশাপাশি, উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে আসন অনেকটাই কমে গেছে। বিরোধী হিসেবে আগের থেকে অনেক শক্তিশালী হিসেবে উঠে এল কংগ্রেস। ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতা দখল করতে না পারলেও দুশোর ওপর আসন নিয়ে সরকারকে অনেকটাই চাপে রাখতে পারবে। সুস্থ গণতন্ত্রের স্বার্থে শক্তিশালী বিরোধী থাকা অত্যন্ত জরুরি। তাই বিরোধীদের এই উত্থান ভারতের গণতন্ত্রকেই হয়তো কোথাও একটা সমৃদ্ধ করল।

ধীমান সাহা

এই হার দলবদলুদের প্রাপ্যই ছিল

এক দলের টিকিটে নির্বাচিত হন। কয়েকদিন পরেই মনে হল, অন্য দলে গেলে কেমন হয়! অন্য দল মানে, শাসক দল। আর তাঁরাও হাত বাড়িয়েই থাকেন।

এই বাংলায় এমন নজির কম নেই। গুনতে গেলে অন্তত পঞ্চাশ ছাপিয়ে যাবে। যাঁরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে জিতে এসেছেন। অর্থাৎ, শাসকদলের বিরুদ্ধে মানুষের রায় নিয়ে জিতে এসেছেন। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই কী অবলীলায় তাঁরা শাসকদলে ভিড়ে গেলেন! যে দল থেকে বিধানসভায় জিতে এসেছেন, সেই সদস্যপদ ছাড়ারও প্রয়োজন মনে করেননি।

এবারের লোকসভা নির্বাচনেও ছিলেন এমন কয়েকজন মহান দলবদলু। যাঁরা বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত। কিন্তু তৃণমূলের পতাকা ধরেছিলেন। স্পিকার মশাই বলে চলেছিলেন, ওঁরা বিজেপিতেই আছেন। কিন্তু ব্রিগেড থেকে যখন লোকসভার প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হল, দেখা গেল, তাঁরা ড্যাং ড্যাং করে প্যারেডে হাঁটছেন।

সেই তালিকায় কারা ছিলেন? রায়গঞ্জের কৃষ্ণ কল্যাণী। বনগাঁয় বিশ্বজিৎ দাস। রানাঘাটে মুকুটমণি অধিকারী। তিনজনই বিজেপির টিকিটে বিধায়ক থাকাকালীনই তাঁরা তৃণমূলের প্রার্থী হলেন। এমনকী তারপরেও পদত্যাগ করলেন না। বিজেপির বিধায় থাকতে থাকতেই তাঁরা তৃণমূলের হয়ে সভা সমিতি করলেন। মিছিল করেলন। দেওয়ালে জলজল করল তাঁদের নাম। নেহাত মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে পদত্যাগ করতেই হত, তাই করা।

চোখ ছিল এই দলবদলুদের দিকে। হ্যাঁ, তিনজনই পরাজিত। এটা অবশ্যই স্বস্তির। বিজেপির দু'জনের কথাও বলতে হয়। একজন অর্জুন সিং। যিনি বিজেপির টিকিটে জেতার পর এসেছিলেন তৃণমূলে। আবার তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে আবার রাতারাতি বিজেপি। টিকিটও পেয়ে গেলেন। তিনিও ব্যারাকপুর থেকে পরাজিত। তাপস রায় বিজেপির হয়ে প্রার্থী হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি অন্তত বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আগে বিধায়ক পদ থেকে সরে দাঁড়ান। এই নৈতিকতাটুকু দেখিয়েছেন। তাঁরা দুজনও হেরেছেন।

সবমিলিয়ে এই তৎকাল দলবদলুদের হারটা জরুরি ছিল। জনতার রায়কে যেভাবে তাঁরা নিলাম করেছেন, এই হারটুকু অন্তত তাঁদের প্রাপ্যই ছিল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী! যাঁকে খুশি করলেই হল!

সরল বিশ্বাস

বছর পাঁচ আগের কথা। তিনি সেবার সদ্য তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসেছেন। দুই দলেই দলবদলুদের বিশেষ কদর। তাই বিজেপিতে এসে টিকিট পেতে সমস্যা হয়নি।

আগেরবার দেওয়ালে লেখা ছিল, তৃণমূল প্রার্থী সৌমিত্র খাঁকে ভোট দিন। পরেরবার দেওয়াল লিখন বদলে 'বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁকে ভোট দিন'। যে দলে ছিলেন, সেই দলের বিরুদ্ধেই তিনি তখন হুঙ্কার ছাড়ছেন। বলে বসলেন, 'আমি চ্যালেঞ্জ করছি, অভিষেক ব্যানার্জির ক্ষমতা থাকলে আমার বিরুদ্ধে এসে দাঁড়াক।'

অভিষেককে তিনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তেই পারেন। কিন্তু 'আমার কেন্দ্রে এসে দাঁড়াক' এই চ্যালেঞ্জটার কী মানে? বিষ্ণুপুর লোকসভা আসনটি তপশিলি জাতি সংরক্ষিত। সেখানে

অভিষেক কীভাবে দাঁড়াবেন? তাঁর যদি এতই চ্যালেঞ্জ নিতে ইচ্ছে হয়, তিনি গিয়ে ডায়মন্ড হারবারে দাঁড়াতে পারতেন। বা অন্য কোনও কেন্দ্রে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন।

আসলে, এই হল মুশকিল। তিনি যে তপশিলি সংরক্ষিত আসনে লড়ছেন, সেই আসনে যে জেনারেল কাস্টের কেউ দাঁড়াতে পারবেন না, এটুকুও খেয়াল থাকে না। এইসব লোক এমপি হলে যা হয়, তাই হয়েছে। এবার জেতার পর তিনি দাবি জানিয়ে বসলেন, 'আমাকে পূর্ণমন্ত্রী করা হোক।' দাবি জানিয়েই ক্ষান্ত থাকলেন না। একেবারে প্রকাশ্যে বিভিন্ন চ্যানেলে বলতে থাকলেন। আমাকে পূর্ণমন্ত্রী করতে হবে, কাউকে এমন দাবি করতে শুনিনি।

তিনি বললেন, সুকান্ত আমার থেকে জুনিয়র। আমি ওর আগে থেকে এমপি। কিন্তু এই আহাম্মককে কে বোঝায়, ডক্টর সুকান্ত মজুমদার একজন ডক্টরেট। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আর তিনি ছিলেন হায়ার সেকেন্ডারি পাস পঞ্চায়েতের ঠিকাদার। এই তফাতটা কতটা, বোঝার বিদ্যেটুকু তিনবারের সাংসদের নেই। আসলে, যাঁর পঞ্চায়েত মেম্বার হওয়ার যোগ্যতা নেই, তিনি হঠাৎ করে এমপি হয়ে গেলে এমনটাই হয়। তিনি কিনা দাবি করে বসছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করতে হবে। তাও আবার পূর্ণ মন্ত্রী। আচ্ছা, উচ্চারণ তো করে দিলেন। 'পূর্ণমন্ত্রী' বানানটা লিখতে দিলে লিখতে পারবেন! এমপি হওয়ার আগে বিষ্ণুপুর বানানটাও ইংরাজিতে লিখতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

আসলে, দোষটা শুধু সৌমিত্রর নয়। আশেপাশে এমন এমন লোকজনদের দেখছেন, তাঁর মনে হয়েছে, এঁরা হলে আমি নয় কেন? তিনি দেখছেন, প্রধানমন্ত্রী এমন একটা বিষয় নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি করেছেন, যে সাবজেক্টটার কোনও অস্তিত্বই ছিল না। তিনি দেখছেন, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এমন একজন, যিনি সিবিআই বা ইডি রিপোর্ট দিলে এক পাতা পড়ে বুঝতে পারবেন না।

এই রাজ্যেও নমুনার অভাব ছিল না। তিনি দেখেছেন মাধ্যমিক পাস নিশীথ প্রামাণিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি দেখেছেন জন বার্লা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাই হয়তো তাঁরও ইচ্ছে হয়েছে। আসলে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পদটার কী ওজন, এটা বুঝতে গেলে ন্যূনতম যেটুকু পেটে বিদ্যে থাকা দরকার, তা এই কীর্তিমানের নেই। কারও শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে কটাক্ষ করা সমীচিন নয়। কিন্তু পনেরো লাখ মানুষের প্রতিনিধির যদি ন্যূনতম কাণ্ডজ্ঞানটুকু না থাকে, তখন আয়না ধরাটাও জরুরি।

হ্যাঁ, এই অর্বাচীনরাই সাংসদ। এই অর্বাচীনরাই কেন্দ্রে 'পূর্ণমন্ত্রী' হতে চান। কাকে জেতালেন, বিষ্ণুপুরের মানুষও কি একটু আত্মসমীক্ষা করবেন না!

অতিভক্তির খেসারত দিতে হল অযোধ্যায়

প্রশান্ত বসু

এবারের লোকসভায় কোন কেন্দ্রের ফল সবথেকে বেশি আনন্দ দিয়েছে? চাইলে আমাদের রাজ্যের ৪২টা কেন্দ্রের কথা ভাবা যেত। কিন্তু পরে মনে হল, না, নিজের রাজ্য নয়। এর উত্তর ভিন রাজ্যেই লুকিয়ে আছে। উত্তর হল, অযোধ্যা। আরও ভালভাবে বললে, ফৈজাবাদ। এখানে যে বিজেপি হারতে পারে, সত্যিই ভাবিনি। বলা যায়, কল্পনারও অতীত ছিল। এবং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এই ধাক্কাটা সত্যিই খুব জরুরি ছিল।

রামকে যেভাবে রাজনীতির আঙিনায় এনে ফেলা হয়েছে, তা কখনই মন থেকে মেনে নিতে পারতাম না। আমি কোনও রামায়ন বিশারদ নই। রামায়ন জ্ঞান বলতে ছোটবেলায় প্রতি রবিবার সকালে রামানন্দ সাগরের সেই সিরিয়াল। আর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা কিছু লেখা। আর লোকমুখে কিছু গল্প শোনা। অন্যদের গল্পে কিছুটা কান পাতা।

আমার ধারণা, বিজেপির যাঁরা রাম রাম করে চিৎকার করেন, তাঁদের জ্ঞানও ওই টুকুই। বা হয়তো আরও কম। অন্তত টিভির আলোচনা শুনে মনে হয়, আমি তবু ছোটবেলায় রামায়নটুকু দেখেছি। এই আহাম্মকরা সেটাও দেখেননি। বা দেখলেও বেমালুম ভুলে গেছেন। কিছুই আত্মস্থ করতে পারেননি। বাল্মীকি বলুন, তুলসীদাস বলুন, কৃত্তিবাস বলুন, কোনও রামায়নই এঁরা পড়েননি।

এবার যেভাবে রাম মন্দির উদ্বোধন হল, তাতে রামকে নেহাতই গৌণ চরিত্র মনে হয়েছে। এ যেন একজনকে প্রতিষ্ঠা করার মহামঞ্চ। নিজেকে জাহির করা কোন নির্লজ্জ স্তরে পৌঁছোতে পারে এবং মূলস্রোত মিডিয়া কতটা নির্লজ্জ স্তাবকতা করতে পারে, তা দেখে সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। আগেরবার একটা পুলওয়ামা ছিল। এবার যদি তেমন মোক্ষম কোনও ইস্যু না পাওয়া যায়। অতএব, রামের নামেই ভোট বৈতরনী পেরোতে হবে। একটা দল দশ বছর সরকার চালিয়েছে। তারপরেও তাদের এমন ইস্যু খুঁজতে হয়! দশ বছরের সাফল্যকে ছাপিয়ে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রচার করতে হয়!

এঁরা কি সত্যিই রামের অনুরাগী? রামের জীবন দর্শনের সঙ্গে এঁদের জীবন দর্শনের কোনও মিল আছে? রাম বাবার সামান্য একটা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে রাজত্ব ছেড়ে জঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। আর এঁরা ক্ষমতায় আসার জন্য সব করতে পারেন। যত দূর নীচে নামার, নামতে পারেন। রাম ধর্মের নামে বিভেদ বা বিভাজন চাননি। কিন্তু বিভাজন আর ঘৃণাই এঁদের মূলমন্ত্র। যদি ক্ষমতায় থাকার জন্য রামমন্দির গুঁড়িয়ে দিতে হয়, এঁরা সেটা করতেও কসুর করবেন না। এত অনাচার কি সত্যিই রামের সহ্য হয়!

জানি না, সত্যিই রাম বলে কেউ আছেন কিনা। যদি থেকে থাকেন, তাহলে তিনি উচিত শিক্ষা দিয়েছেন।

বাস্তবের মাটিতে এসে ঠোক্কর খায় ‘উইশফুল থিঙ্কিং’

সরল বিশ্বাস

ইংরাজিতে একটা চালু কথা আছে, উইশফুল থিঙ্কিং। অর্থাৎ, আমি কী চাই। এবারের লোকসভা ভোটে এই বাংলায় সেই কথাটা যেন আরও বেশি করে মনে পড়ে যাচ্ছে।

এবার বামেরা ঠিক কতগুলো আসন পেতে পারে? যে কোনও বাম নেতত্বের সঙ্গে কথা বলুন। মনে হবে, যাদবপুরে সৃজন ভট্টাচার্য জিতে যাবেন। শ্রীরামপুরে দীপ্সিতা ধর জিতে যাবেন। যাদবপুরে সুজন চক্রবর্তী জিতে যাবেন। আর মুর্শিদাবাদে মহম্মদ সেলিম তো জিতে বসেই আছেন।

ভোটের যে কোনও বাম কর্মী বা নেতার কথা শুনলে এমনটাই মনে হচ্ছিল। যাঁরা সারাদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখেন, তাঁরা অদ্ভুত একটা স্বপ্নরাজ্যে বাস করেন। তাঁরা যেটা দেখেন, যেটা পছন্দ করেন, তাঁদের কাছে তেমনই লিঙ্ক আসে। তেমনই ভিডিও আসে। যিনি বামেদের পোস্ট বা ভিডিও তে লাইক দেন, তাঁদের কাছে এই জাতীয় পোস্টই আসে। যার ফলে মনে হয়, চারপাশ বোধ হয় লাল পতাকায় মুড়ে গেছে। আবার বামেদের লাল ঝড় উঠল বলে!

আসলে, এ হল নিখাদ এক উইশফুল থিঙ্কিং। ফেসবুকে সারাক্ষণ যা দেখছি, মনে মনে সেটাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছি। কিন্তু বাস্তব অঙ্কটা মোটেই তেমন নয়। মুর্শিদাবাদে মহম্মদ সেলিম দারুণ লড়াই করবেন। এটা বোঝা যাচ্ছিল। হয়তো জিতে যেতেও পারেন, এমনটা মনে হচ্ছিল। হ্যাঁ, দুরন্ত লড়াই করেছেন। পাঁচ লাখের ওপর ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন। এটা হাওয়া নয়, রাজনৈতিক কারণেই সম্ভব হয়েছে। বাম ও কং জোটের যথার্থ মেলবন্ধনেই সম্ভব হয়েছে। সহজ কথা, যেখানে জেতার সম্ভাবনা থাকবে, সেখানে বড় অংশের সংখ্যালঘু ভোট আসবে। সেখানে দোদুল্যমান ভোটও আসবে। সেখানে নিখাদ তৃণমূল বিরোধী ভোটও বাম-কং বাক্সেই জমা পড়বে। মুর্শিদাবাদে ঠিক সেটাই হয়েছে। তাই জয় না এলেও দুরন্ত লড়াইটা দেওয়া গেছে।

এর বাইরে আর কোনও বাম প্রার্থীর জেতার সুদূরতম সম্ভাবনাও ছিল না। এমনকী, দ্বিতীয় হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। ভোটের সময়ই লিখেছিলাম, লিখতে খারাপ লাগছে। তবু লিখতেই হচ্ছে, বাকি সব আসনেই অনেক পিছিয়ে থেকে তৃতীয় হবে। কোথাও জিতবে তৃণমূল, কোথাও বিজেপি। একদল যখন সাত লাখ ভোট পাবে, অন্য দল পাবে ছ লাখের মতো। সেখানে বামেদের ভোট এক লাখ থেকে দেড় লাখ। হ্যাঁ, যাদবপুর, দমদম বা শ্রীরামপুরের ক্ষেত্রেও অঙ্কটা হয়তো দেড় লাখের আশেপাশেই থাকবে।

দেখা গেল, সেটাই হয়েছে। এই তিন কেন্দ্রে আড়াই লাখের কাছাকাছি ভোট এসেছে। বাকি কেন্দ্রগুলোয় একলাখের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করেছে। অনেক জায়গায় এক লাখেরও কম। ডায়মন্ড হারবার, বসিরহাটের মতো জায়গায় বামেদের থেকে আইএসএফের ভোট বেশি।

তাই বলে কি সৃজন বা দীপ্সিতা খুব খারাপ প্রার্থী? একেবারেই না। বরং, উল্টোটা। ওই কেন্দ্রের তৃণমূল বা বিজেপি প্রার্থীদের থেকে হাজারগুন এগিয়ে। এই ছেলে-মেয়েদের দেখলে ভরসা হয়। এঁদের কথা মুগ্ধ হয়ে শুনতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, এই ছেলেগুলোরই তো সংসদে যাওয়া উচিত। সংসদ তো এঁদেরই জায়গা। কিন্তু তারপরেও বলতেই হচ্ছে, ভোটের অঙ্ক বড়ই নির্মম। একেবারে প্রান্তিক মানুষের কাছে এঁদের কথার আবেদন পৌঁছোয়নি। ফেসবুকে আমরা যে ছবিটা দেখি, সেটা আমাদের আনন্দ দেয়, আপ্লুত করে, এই আকালেও স্বপ্ন দেখার সাহস দেয়। কিন্তু ওই টুকুই। সেই স্বপ্ন বাস্তবের মাটিতে এসে হোঁচট খায়।

মোদিই বোঝা, এই সত্যিটা বঙ্গ বিজেপি কবে যে বুঝবে!

নির্মল দত্ত

প্রথম কয়েক দফায় এমনটা দেখা যায়নি। ভোট মোটামুটি শান্তিতেই হয়েছে। কিন্তু ভোট পর্ব যতই এগোলো, শাসকের হুম্বিতুম্বি যেন বাড়তে লাগল। ভোটের দিন যেখানেই বিরোধী প্রার্থীরা যাচ্ছেন, সেখানেই গো ব্যাক স্লোগান। মোদ্দা কথা, প্রার্থীকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না।

এই জাতীয় বিক্ষোভকে যতই এলাকাবাসীর বিক্ষোভ বলে চালানোর চেষ্টা হোক, এর সঙ্গে এলাকাবাসীর আবেগের কোনও সম্পর্কই নেই। এই জাতীয় বিক্ষোভ মোটেই স্বতস্ফূর্ত নয়। একেবারেই রাজনৈতিক। এবং এই জাতীয় বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়।

যাঁদের গ্রামগঞ্জ সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা আছে, তাঁরা জানেন, বিরোধী প্রার্থী কোথায় যাচ্ছেন, তা জানা খুব একটা কঠিন নয়। মোবাইল মারফত

এত সাহস তারা পায় কোত্থেকে? এটা বিজেপি ভাবুক। দিল্লির যে নেতাদের ওপর তাঁরা ভরসা করেছিলেন, তাঁদের নির্দেশে বছরের পর বছর সিবিআই, ইডি ঘুমিয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘুমিয়ে রইল। এরপরেও এই মোদির নামে জয়ধ্বনি দিতে ইচ্ছে হয়!

দ্রুত জানিয়ে দেওয়া যায়। অর্থাৎ, যেখানে যাচ্ছেন, সেখানকার মানুষদের সতর্ক করে দেওয়া যায়। প্রার্থী যাচ্ছে, তোমরা তৈরি থাকো। এমন বিক্ষোভ দেখাও, যেন প্রার্থী বুথে ঢোকার সাহসই না পান।

প্রশ্ন হল, ভোটের দিন বুথের আশেপাশে কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকার কথা। বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গেও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাবাহিনী থাকে। তারপরেও রাজ্যের শাসক দল এমন বিক্ষোভ দেখানোর সাহস পায় কীভাবে? আসলে, তৃণমূল নেতৃত্ব খুব ভাল করেই জানেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী আছে ঠিকই, কিন্তু তাঁদের কিছুই করার মুরোদ নেই। গুলি চালানো তো দূরের কথা, এমনকী লাঠি বের করতেও পারবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের যাঁরা মাথা, তাঁরা গুটিয়ে থাকার নির্দেশই দিয়েছে।

যদি একটা জায়গায় বাহিনী তার দায়িত্ব পালন করত, যদি এই বিক্ষোভ দেখানো ভাড়াটে লোকেদের একটু রাম প্যাঁদানি দিত, আর কোথাও এমন বিক্ষোভ দেখানোর সাহস হত না। অন্য দিন কোনও দল বিক্ষোভ দেখাতেই পারে। কিন্তু ভোটের দিন তো এই জাতীয় জমায়েত করা যায় না। সেদিন তো ১৪৪ ধারা থাকে। তারপরেও এমন ঘেরাও! এমন বিক্ষোভ! তাও আবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর সামনে!

এত সাহস তারা পায় কোত্থেকে? এটা বিজেপি ভাবুক। দিল্লির যে নেতাদের ওপর তাঁরা ভরসা করেছিলেন, তাঁদের নির্দেশে বছরের পর বছর সিবিআই, ইডি ঘুমিয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘুমিয়ে রইল। এরপরেও এই মোদির নামে জয়ধ্বনি দিতে ইচ্ছে হয়!

এই রাজ্যে বিজেপির যে ভরাডুবি হতে চলেছে, তার জন্য অন্য কেউ দায়ী নন। দায়ী ওই নরেন্দ্র মোদিই। এই রাজ্যে তিনি মোটেই সম্পদ নন। তিনিই সবথেকে বড় বোঝা। এই সহজ সত্যিটা কবে যে বুঝবেন!

ব্যস্ততার মাঝেও চিঠি লিখতে ভুলতেন না

ঋষভ সোম

ব্যস্ততার মাঝেও কীভাবে সময় বের করে নিতে হয়, তিনি জানতেন। চিঠি লেখায় তাই বিরাম পড়েনি। নিয়মিত পাঠকদের চিঠির উত্তর দিতেন। তাঁর লেখা চিঠি কত হাজার হাজার পাঠকের কাছে সারাজীবনের সম্পদ হয়ে আছে। বোঝা গেল, যাঁরা সত্যিকারের ব্যস্ত, তাঁরা ঠিক সময় বের করে নিতে জানেন। লিখেছেন উত্তম জানা।

যাঁরা ব্যস্ত মানুষ, তাঁরা বোধ হয় ঠিক সময় বের করে নিতে পারেন। যাঁরা ততখানি ব্যস্ত নন, তাঁরাই বোধ হয় ‘সময় নেই’ অজুহাত দেন। বুদ্ধদেব গুহ যেন এই চরম সত্যিটাই আরও বেশি করে দেখিয়ে গেলেন।

গত এক-দু মাসে অনেকেই নানারকম স্মৃতিচারণ করেছেন প্রয়াত লেখকের। সেই স্মৃতিচারণে মোদ্দা যে কথাটা উঠে এসেছে, তা হল, তাঁকে চিঠি লিখলে উত্তর পাওয়া যেত। বিখ্যাত লোকেদের তিনি হয়ত প্রচুর চিঠি লিখেছেন। সেগুলি নানা জায়গায় সংকলিতও হয়েছে। কিন্তু একেবারে সাধারণ পাঠকদেরও নিরাশ করেননি। যে কেউ চিঠি লিখে তাঁর উত্তর পেয়েছেন। কেউ পত্রিকা পাঠালে তিনি পড়েছেন। মতামত জানিয়েছেন। সেই চিঠিগুলি পাঠকের কাছে পরম এক সম্পদ হয়ে আছে। গত কয়েকদিনে সোশ্যাল মিডিয়া বা হোয়াটসঅ্যাপের বিভিন্ন গ্রুপে এমন অসংখ্য চিঠির সন্ধান পাওয়া গেল।

বুদ্ধদেব গুহ কি খুব কম ব্যস্ত ছিলেন? দিনে প্রায় বারো ঘণ্টা সময় এমন আবহে কাটিয়েছেন, যার সঙ্গে সাহিত্যের সুদূরতম সম্পর্কও নেই। তিনি ছিলেন একজন অন্যতম সফল চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। আজ এই ট্রাইব্যুনাল, কাল ওই ট্রাইব্যুনালে ঘুরতে হয়েছে। আজ দিল্লি, কাল মুম্বই যেতে হয়েছে। মক্কেলদের জন্য পড়াশোনা

করতে হয়েছে, প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। এর সিকিভাগ ধকল নিয়েই আমরা হয়ত ক্লান্ত হয়ে যেতাম। মনে হত, ঢের করেছি। এবার বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

আর উনি কী করেছেন? এই জঙ্গল থেকে ওই জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। প্রান্তিক মানুষদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশেছেন। একের পর এক কালজয়ী লেখা লিখে গেছেন। পড়াশোনার পেছনেও বড় একটা সময় ব্যয় করেছেন। সেই তালিকায় অতীতের কালজয়ী লেখকরা যেমন আছেন, বর্তমান সময়ের একেবারে অনামী লেখকরাও আছেন। খুব কম সাহিত্যিকই অন্যের লেখা পড়েন। যাঁরা পড়েন, সেই তালিকায় একেবারে অগ্রগণ্য বুদ্ধদেব গুহ। নিয়মিত অন্যের লেখা পড়তেন, চিঠি লিখে উৎসাহ দিতেন।

হ্যাঁ, এই চিঠি লেখা। যে কাজটা এখন প্রায় উঠেই গেছে। তিনি কিন্তু এই বিরল শিল্পটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। নিজের দৈনন্দিন জীবনচর্চার অঙ্গ করে তুলেছিলেন। সত্যজিৎ রায় নাকি ভোরে উঠেই চিঠি লিখতে বসতেন। বুদ্ধদেব গুহ কখন চিঠি লিখতেন? সকালের দিকে? নাকি রাতের দিকে? নাকি কাজের ফাঁকে? জানি না। দিনে ঠিক কতগুলো চিঠি লিখতেন, তাও জানি না।

এই ফেসবুক, টুইটারের যুগে আর কোনও লেখক কি এভাবে পাঠককে চিঠি লেখেন? তাও জানি না। হয়ত হোয়াটসঅ্যাপে উত্তর দেন। হয়ত দু এক লাইনের মেসেজ করেন। কিন্তু বুদ্ধদেব গুহ না কম্পিউটারের লিখেছেন। না স্মার্টফোনে উত্তর দিয়েছেন। তিনি সরাসরি চিঠিই লিখতেন।

বোঝা গেল, যাঁরা সত্যিকারের ব্যস্ত মানুষ, তাঁরা ঠিক সময় বের করে নিতে পারেন। আর যাঁরা পারেন না, তাঁরাই ব্যস্ততার অজুহাত দেন। যাঁরা তেমন সাহিত্য অনুরাগী নন, তাঁদের কাছেও অন্তত এই একটা ব্যাপারে মোক্ষম শিক্ষা দিয়ে গেলেন কিংবদন্তি এই মানুষটা।

গোয়েন্দা-কাহিনিও লিখেছিলেন আশাপূর্ণা!

শোভন চন্দ

আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতই তাঁর বেড়ে ওঠা। তবে সময় যেন তাঁকে সবার থেকে আলাদা করে দিয়েছে, করে তুলেছে অনন্যা। একটু মজা করে বলতে গেলে, বাংলা সাহিত্যের রান্না ঘরে ইনি পাকা রাঁধুনি, পরম যত্নে-স্নেহে একের পর এক উপহার আমাদের দিয়ে গেছেন। তৎকালীন সমাজের প্রতিবন্ধকতাকে ছিন্ন করে সাহিত্যকে দিয়েছেন তাঁর অনন্য সৃষ্টি, বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজকে তাঁর লেখনীগুণে করেছেন সমৃদ্ধ। তবে কেমন ছিলেন গৃহিনী আশাপূর্ণা, কেমন ছিলেন সবার প্রিয় মাসিমা আশাপূর্ণা দেবী, সেই অজানা -অদেখা স্মৃতিচারণে নানা মজার কথা তুলে ধরলেন আমাদের সকলের প্রিয় ভানুবাবু (সবীতেন্দ্রনাথ রায়)।

আশাপূর্ণা দেবীর সান্নিধ্যে যখন প্রথম যাই তখন আমি নিতান্তই তরুণ, সবে প্রকাশনার কাজে ঢুকেছি। সে সময়ে তাঁর উপন্যাস 'বলয়গ্রাস' ছাপা হচ্ছে। এটি কোনও পত্র-পত্রিকায় বেরোয়নি। আশাপূর্ণা দেবী সরাসরি পাণ্ডুলিপি লিখে দিচ্ছিলেন কিস্তিতে- কিস্তিতে। আমি আনতে গেলাম সম্ভবত তৃতীয় কিস্তি। আমরা দরজায় যেতেই একটি মেয়ে দরজা খুলে আমাদের বসাল, আমরা বসবার পর মেয়েটি জলখাবার দিয়ে গেল। বলল একটু বসুন, মা ঠাকুমাকে খাইয়ে আসছেন।

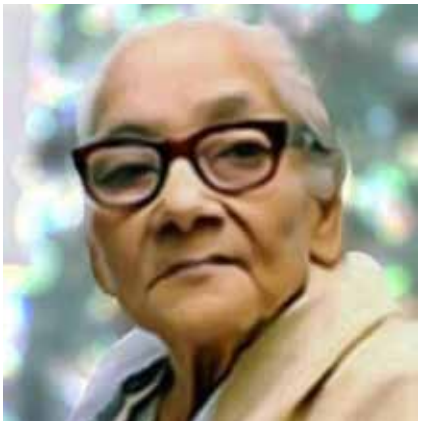

কিছুক্ষণ বাদে আশাপূর্ণা দেবী এলেন। হাতে সুন্দর লাইন টানা পাণ্ডুলিপি। সত্যি বলতে আশাপূর্ণা দেবীর সাথে এক মিষ্টি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আশাপূর্ণা দেবী ও কালিদাস গুপ্ত একরকম আমাদের মাসিমা মেসোমশাই ছিলেন, আশাপূর্ণা দেবীর বাড়ি ছিল প্রথমে দর্জিপাড়ায়, উত্তর কলকাতায়। একান্নবর্তী পরিবার সেকালের কট্টর রক্ষণশীলতার মধ্যে বড় হয়ে উঠেছিলেন আশাপূর্ণারা। ঠাকুমা ছিলেন কর্ত্রী। তাঁর কড়া হুকুম- বাড়ির মেয়েরা গৃহকর্ম শিখবে শুধু, লেখাপড়ার ধারেকাছে যাবে না। দাদারা পড়তেন গৃহশিক্ষকের কাছে। দাদারা তখন সদ্য স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ লিখতে শিখেছেন। আশাপূর্ণা উল্টো দিকে বসে থাকতেন দাদাদের পড়াশুনো লক্ষ্য করতেন। তাই দেখে আশাপূর্ণা শেখেন লিখতে, কিন্তু সব

উল্টোভাবে, যেহেতু উল্টোদিকে বসে লিখতেন। মেয়ের লেখাপড়ার উৎসাহ দেখে মা রাতে শোওয়ার সময়ে আয়নায় উল্টো লেখা দেখিয়ে কীভাবে সোজা লিখতে হয় তা শেখালেন। শুরু হল মায়ের কাছে বই পড়া ও লেখার প্রথম পাঠ। বাবা হরেন্দ্রকুমার ছিলেন শিল্পী। মা –বাবার শিল্পী মানসিকতার প্রভাবে এইভাবে আশাপূর্ণা সাহিত্যপাঠের জগতে প্রবেশ করলেন। সত্যি বলতে, এক চরম দুঃসাহসে কবিতা লিখে ফেললেন আশাপূর্ণা, নাম দিলেন – 'বাইরের ডাক'। কিছুদিন পরে কবিতাটি শিশুসাথী পত্রিকাতে প্রকাশিত হল।

তখনকার প্রথামতো আশাপূর্ণা দেবীর বিয়ে হয়ে যায় অল্প বয়সেই , বছর পনেরো তখন তিনি। শ্বশুরবাড়ি সেকালের রক্ষণশীল পরিবার।
তখনকার রক্ষণশীল পরিবারে, সমাজে কোন মহিলা লিখছেন এবং সেই লেখা পত্র- পত্রিকায় বেরোচ্ছে কেউ ভাবতে পারত না। কালিদাসবাবু নিজেই ব্যবস্থা করে দেন, যাতে পত্নী রাত্রে হ্যারিকেনের আলোয় লিখতে পারেন। কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখতে লণ্ঠন, যাতে আলো বাইরে না যায়। লেখা হলে নিজেই পৌঁছে দিতেন পত্র- পত্রিকাতে।

একদিন আশাপূর্ণা দেবী রাতে আমায় ফোন করলেন, ভানু , তোমার মেশোমসাই ও আমি কাল দুপুর বারোটার ট্রেনে শ্বশুরবাড়ি যাব। তুমি কষ্ট করে দুটো বই –একটা "বলয়গ্রাস" আর একটা "নির্জন পৃথিবী" কৃষ্ণনগরের ট্রেনে পৌঁছে দেবে । তাহলে আমার শ্বশুর বাড়িতে মুখ রক্ষে হয়। আমরা ১২ টার ট্রেনে যাব।

সেই মত পৌঁছে দিয়ে বললাম, মাসিমা এবার তাহলে ধারাবাহিকটা শুরু করা যাক মাসিমা হেসে বললেন সামনের মাস থেকে দেব ,প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি । আমি বললাম তাহলে নামটা দিন আগে থেকে বিজ্ঞাপন করতে হবে তো। উনি বললেন ওই প্রতিশ্রুতি দাও না না বরং "প্রথম প্রতিশ্রুতি" দাও । সেই "প্রথম প্রতিশ্রুতি" উপন্যাসের ভিত্তিস্থাপন । ১৩৬৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে প্রথম প্রতিশ্রুতি ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে ।

জন্মদিনে রাধাবল্লভী, দরবেশ চমচমের সঙ্গে আশাপূর্না দেবীর নিজের হাতে ভাজা বেগুনী অন্যতম চিত্তাকর্ষক খাবার ছিল। বড় সুখের দিন ছিল। "প্রথম প্রতিশ্রুতি" উপন্যাস "রবীন্দ্র- পুরস্কার" পেল । ১৯৭৭ সালে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেল। সংসারে অবিমিশ্র সুখ বা দুঃখ হয় না, জ্ঞানপীঠ ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ল কালিদাস বাবুর কঠিন ব্যাধি – ক্যান্সার। তার বয়স ও স্বাস্থ্য বন্ধু প্রিয়জনদের চিন্তার কারণ হয়ে উঠল, পুরস্কার হাতে নেওয়ার সময় কালিদাস বাবু সুস্থ থাকবেন তো? আশাপূর্ণা দেবীর সঙ্গে যেতে পারবেন তো ? বন্ধু বান্ধবরা ঠিক করলেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রদানের আগেই কলকাতায় মহাবোধি সোস্যাইটি হলে আশাপূর্ণা দেবীকে এই উপলক্ষ্যে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। গুণমুগ্ধ সাহিত্যিক সাহিত্যমোদীদের আন্তরিকতায় সে সংবর্ধনা সভাটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল।

কালিদাসবাবু চলে যান ১৯৭৮ খ্রীঃ ১৮ই মার্চ। আশাপূর্ণা দেবী জ্ঞানপীঠ পুরস্কার নিতে যাওয়ার আগেই কালিদাস বিদায় নেন। অবশ্য কালিদাস বাবু বিয়ের দিন থেকেই আশাপূর্ণা দেবীর ব্যক্তি স্বত্বা সাহিত্যিক স্বত্বা উভয়কেই আগলে রাখতেন। "দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে" উপন্যাসে এই পত্নিকে আগলে রাখার একটি আভাস পাওয়া যায় । প্রায় সুস্থ থাকার শেষ দিন পর্যন্ত আশাপূর্ণা কলম চালনা করেছেন তারপর কলম চালনা আর অন্ন গ্রহণ এক সঙ্গে থেমেছে । ১৯৯৫ খ্রীঃ ১৩ ই জুলাই তিনি পরপারে যাত্রা করেছেন, তবে তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি আজও থেকে গেছে···

পানশালার সেই হারিয়ে যাওয়া সন্ধে

সুপ্রিয় চ্যাটার্জি

মধ্য কলকাতার একটি পুরনো পানশালা। ভিতরে আক্ষরিক অর্থেই তিলধারণের জায়গা নেই। কোনও মতে স্বল্প আলোতেই সন্তর্পণে পানীয়ের গ্লাস, খাবারের প্লেট টেবিলে টেবিলে পৌঁছে দিচ্ছে দক্ষ পরিবেশনকারীরা। রঙিন পানীয়ে শূন্য গেলাস পলকেই পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। একধারে স্টেজ। সেখানে মাইক্রোফোন হাতে কিন্নরকণ্ঠে গাইছেন কোন সুবেশিনী যুবতী বা উচ্ছলকণ্ঠ গায়ক। যোগ্য সঙ্গতে পিছনে সারি দিয়ে বসে থাকা মিউজিশিয়ানেরা। 'তেরে বিনা জিন্দেগিসে কোই শিকওয়া', 'ইয়ে দিল তুম বিন' , 'আকাশ প্রদীপ জ্বলে' থেকে 'মনে পড়ে রুবি রায়' , 'রানার' থেকে শুরু করে 'পুরানো সেই দিনের কথা' , লতা, কিশোর, রফি, আশা, মান্না, হেমন্ত, শ্যামল, আরতি সন্ধ্যা, সবার গান একের পর এক গাওয়া হয়ে চলেছে, এমনকি রবীন্দ্রসঙ্গীতেরও ইতিউতি উপস্থিতি সেখানে।

সব মিলিয়ে মিনি ফাংশন। বাড়তি পাওনা বহু পুরনো অধুনালুপ্ত গান, যা শ্রোতার অভাবে আজকাল ফাংশনে আর খাওয়া হয় না। আর সুরা কয়েক পাত্র পান করার পর সেসব গান শোনার নস্টালজিক রোমান্টিকতা আর

তো কোথাও মাথা খুঁড়লেও মিলবে না।

নৌশাদ, ও পি নায়ার, শচীন কত্তা, সবার গান শুনতে চাইলে গাইবার কুশলীর অভাব নেই। ওয়ক্ত, পাকীজা, দোস্ত, তাজমহল পুরনো বিখ্যাত সব ছবির গানের ডালি।

লাইভ ব্যান্ড। চলতি কথায় সিঙ্গিং বার। বারে সুরাপান করতে গিয়ে সাথে বাড়তি পাওনা সংগীতলহরী। সন্ধ্যা হলেই উপচে পড়া ভিড়। চাকুরী জীবী, ব্যবসায়ী, উকিলবাবু, উঠতি মস্তান, জমির দালাল, কে নেই সেই ভিড়ে। কলকাতায় নৈশ আমোদ প্রমোদের তালিকায় উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই বিনোদন জায়গা করে নিয়েছে বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে।

মূলতঃ এই বারগুলি ছিল মধ্য কলকাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ডেকার্স লেনের পিঙ্করুম, মেট্রোপলিটন, চাঁদনী, ওয়াটার লু স্ট্রিটের রক্স, চেরিফিক, আর হান থাই, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মনসুখ, সি আর এভিনিউয়ে ক্যালকাটা কাফে, ডিউক, চাঁদনী চকে ম্যাজেস্টিক, নিউমার্কেট এলাকায় রক্সি, প্যারিস, প্রিন্সেস, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোডে গালিব, এসব জায়গায় মূলত বাংলা, হিন্দি গান হত। ইংরেজি গান হত পার্ক স্ট্রিট এলাকায়।

বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত গায়ক গায়িকা একসময় এই বার গুলোতে গান করে গিয়েছেন। উষা আয়ার (তখনও উত্থুপ হননি) পার্ক স্ট্রিটের একটি রেস্তোরাঁয় গেয়ে গিয়েছেন। মহম্মদ আজিজ (মুন্না) গান গাইতেন গালিব বারে।

তবে প্রদীপের নীচের অন্ধকারের কাহিনীও আছে। প্রথা অনুযায়ী, গায়িকার কণ্ঠের প্রতি অনুরাগ অনেক ক্ষেত্রেই সুরার সাহচর্যে শ্রোতার মনকে কাঁচপোকার মতো টেনে নিয়ে গিয়েছে মোহের আবেশে, গান শুনে কিছু পারিতোষিক দেওয়ার সীমা ছাড়িয়ে বহু অর্থের অপচয়ের আঁধারে। মোহ যখন কেটেছে, আর ফেরা হয়ে ওঠেনি স্বাচ্ছল্যের দিনে। আগের সোনালী দিনগুলি হারিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। শ্রোতার আসনে নতুন প্রজন্ম, অসামাজিক নানান চরিত্র। তাদের পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে বিদায় নিয়েছে একে একে সুকণ্ঠ শিল্পীরা, তাদের জায়গায় এসেছে চটুল নৃত্যপটু কিশোরী ও যুবতীরা, মিউজিশিয়ানদের জায়গায় ল্যাপটপে ট্র্যাকে হালফিলের লাউড মিউজিক, সাইকোডেলিক আলো, অর্থের স্রোত উপচে পড়ে পানশালার মেঝেতে।

মধ্য কলকাতার এলাকা ছাড়িয়ে সিঙ্গিং বার (বর্তমানের চলতি নাম ড্যান্সবার) ছড়িয়েছে গোটা কলকাতায়, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলার শহর ও শহরতলিতে। বহু মানুষের জীবিকা যেমন চলে তেমনি প্রশাসনের স্থায়ী মাথাব্যথার কারণ এই হঠাৎ গজিয়ে ওঠা প্রমোদ কাননগুলি। সংখ্যায় বেড়েছে অবশ্যই। সুখে বেড়েছে কি না জানি না। তবে মন বলে, ‘বাঁশি বুঝি সেই সুরে আর বাজবে না...’।

Sundarban Residency

এবার শীতে সুন্দরবন

2N / 3D Special Package

বিশেষ ছাড়

★ Godkhali to Godkhali

1800 103 9161

sundarbanresidency.com

স্মৃতিটুকু থাক

সেই মাধবকাকুরা হারিয়ে যাচ্ছে

আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা মেদিনীপুরের এক মফস্সলে। আমাদের এলাকায় একজন পিওন এসেছিলেন। আমরা তাঁকে মাধবকাকু বলতাম। মাত্র কয়েক-দিনেই সবাইকে দিব্যি চিনে নিয়েছিলেন। কার কাছে কী ধরনের চিঠি আসে, কোন চিঠি কাকে দিতে হয়, ঠিক জানতেন।

একবার আমাকে খুব বড় একটা বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। এক বিয়ে-বাড়িতে একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কিন্তু সে যে এভাবে চিঠি লিখে ফেলবে, কে জানত! প্রেম নিবেদন করে মস্ত এক চিঠি পাঠিয়েছিল। ওই চিঠি যদি বাবার হাতে যেত, নির্ঘাত বকুনি জুটত।

মাধবকাকু সেই চিঠি বাবার হাতে দেননি। আমাকে দেখতে পেয়ে একদিন ডাকলেন। বললেন, 'তিন দিন ধরে তোমাকে খুঁজছি। ইচ্ছে করেই বাড়িতে দিইনি। কোনও ভয় নেই। তোমার চিঠি আমি তোমাকেই দেব।'

এখন লোকে চিঠি লিখতেই ভুলে গেছে। মাধবকাকুদের মতো চরিত্ররাও বোধহয় হারিয়ে গেছে।

পিয়ালি সেনগুপ্ত, ভদ্রেশ্বর

(এই বিভাগ কিন্তু একান্তই পাঠকদের জন্য। আপনারাও লিখে পাঠান আপনাদের অনুভূতি। বিশেষ কারও কথা মনে পড়ছে? অতীতের কোনও কাজের জন্য ভুলস্বীকার করতে ইচ্ছে করছে? বলে ফেলুন। দেখুন, অনেক হালকা লাগবে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা: bengaltimes.in@gmail.com)

এই গান গেয়ে টাকা নিতে পারব না

রাতুল বিশ্বাস

তারকা সমাগম বলতে যা বোঝায়! ছবিতে কে নেই! উত্তম কুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ। এঁরা তখনই দিকপাল। তখনও মহুয়া রায়চৌধুরি বা প্রসেনজিৎ সেভাবে তারকা হয়ে ওঠেননি। এমন ছবির হিরো কিনা সুখেন দাস! তিনিই আবার ছবির পরিচালক। সঙ্গীত পরিচালক তাঁরই দাদা অজয় দাস।

কিন্তু ছবির গানগুলো কাকে দিয়ে গাওয়ানো যায়! অজয় দাস চাইছেন, বাংলার চেনা কণ্ঠের বাইরে নতুন কোনও কণ্ঠ! কিশোর কুমার হলে কেমন হয়! প্রশ্নটা ভাসিয়ে দিলেন সুখেন দাস। অজয় দাস তো এক কথায় রাজি। কিন্তু কিশোরের সঙ্গে আলাপটুকুও নেই। এত বাজেটও নেই। কে তাঁকে বম্বে গিয়ে রাজি করাবেন? একেকটা গানের জন্য তিনি তখন অন্তত পনেরো হাজার পারিশ্রমিক নিচ্ছেন। বম্বে যাতায়াতের খরচাও তো কম নয়। কার মাধ্যমে যোগাযোগ হবে?

কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই সুখেন দাস বললেন, এখানে কাউকে ধরলে হবে না। সটান বম্বে চলে যাওয়াই ভাল। তিন চার দিন থাকলে কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই চললেন দুই ভাই। সঙ্গে দুই প্রযোজক। উঠলেন একটা হোটেলে। কিন্তু কীভাবে কিশোর কুমারের কাছে পৌঁছনো যায়! সুখেন দাস আগেই খোঁজ নিয়েছিলেন। সেখানে কিশোর কুমারের ড্রাইভার আবদুলকে ধরতে পারলে কিছু একটা উপায় হয়ে যাবে। আবদুল কিছু না কিছু ব্যবস্থা ঠিক করে দেবে।

আবদুলের সঙ্গে যোগাযোগ হল। হোটেলে ডেকে তাঁকে ঢালাও খাওয়ানো হল। আবদুল বলে গেলেন, আমি তিন-চার দিনের মাথায় ঠিক ডেট ম্যানেজ করে দেব। তিন দিন পেরিয়ে গেল। এদিকে, আবদুল আশ্বাস দিয়েই চলেছেন। শেষমেষ একদিন

আবদুল বললেন, কাল মেহবুব স্টুডিও বুক করে রাখুন। উনি ঠিক পৌঁছে যাবেন। কালই রেকর্ডিং করিয়ে দেব। আলাপ নেই, পরিচয় নেই, কী গান গাইতে হবে, তাও জানেন না। এভাবে রেকর্ডিং হয় নাকি! সন্দেহ হল, কিন্তু এখন আবদুলকে ভরসা করা ছাড়া উপায়ও নেই। আবদুল মাঝে মাঝেই এসে প্রোডিউসারের কাছে টাকা পয়সা নিয়ে যাচ্ছেন। যথারীতি মেহবুব স্টুডিও বুক করা হল। মিউজিসিয়ানদের বুক করা হল। প্রায় হাজার তিরিশেক খরচ। কিন্তু অনেক অপেক্ষার পরেও কিশোর কুমারের দেখা নেই।

কোনও যোগাযোগ না করে এভাবে কেউ কিশোর কুমারের রেকর্ডিং করাতে আসে? যাঁরা ডেট নিয়ে আসেন, তাঁদেরই ভোগান্তির একশেষ থাকে না। কোন সাহসে ভর করে সুখেন দাস বম্বে চলে এলেন! স্টুডিওতেই এই জাতীয় কথা শুনতে হল। হোটেল ফিরে বেশ মনমরা হয়েই রইলেন সুখেন দাস। ঠিক করলেন, পরেরদিন একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বেন।

পরদিন সকালে দু পাত্র চড়িয়ে নিলেন। কারণ, সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় কিশোর কুমারকে দু-চার কথা শোনানো যাবে না। সকালেই হাজির গৌরীকুঞ্জে। গেটের সামনেই তুমুল চিৎকার জুড়ে দিলেন। সাত সকালে কিশোর কুমারের বাড়ির সামনে চিৎকার? কে? কার এত সাহস? ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন অমিত কুমার। সুখেন দাসের সঙ্গে আলাপ না থাকলেও তিনি সুখেন দাসকে চিনতেন। বললেন, আঙ্কেল আপনি! আসুন, ভেতরে আসুন। বলে ড্রয়িং রুমে বসালেন।

উপরে গিয়ে কিশোর কুমারকে কিছু একটা বললেন। কিশোর নিচে নেমে এলেন। সুখেন দাসের মেজাজ তখন সপ্তমে। এক নাগাড়ে বলে গেলেন, আমরা বাংলা ছবি করি বলে কি আমাদের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করবেন? চিরদিন ধরে আমাদের ঝোলাচ্ছেন। কাল আপনার জন্য রেকর্ডিং স্টুডিও ভাড়া করা হল। এতগুলো টাকা গচ্ছা গেল। আপনি এলেন না। আপনি যদি আমার ছবিতে গান করবেন না, সেটা আগে বললেই পারতেন। এভাবে ঝোলানোর কী মানে হয়!

এক নাগাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন। কিশোর বুঝলেন, কিছু একটা গন্ডগোল হচ্ছে। বললেন, সুখেনবাবু আপনি বসুন। কোথাও একটা গন্ডগোল হচ্ছে। আপনি কী বলছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনার কোন ছবি, কী গান, কোথায় রেকর্ডিং, আমি তো কিছুই জানি না।

সুখেন দাস গত চার দিনের সব ঘটনাই

খুলে বললেন। কিশোর বললেন, 'আবদুল তো আমাকে কিছু বলেনি। কেন সে এমনটা করেছে, আমি ব্যবস্থা নেব। যা হয়েছে, তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। আমি কথা দিচ্ছি, আপনার ছবিতে আমি গান গাইব। ক্যাসেট পাঠিয়ে দেবেন। আর মেহবুব স্টুডিও বুক করে নিন।' ক্যাসেট পাঠিয়ে দেওয়া হল। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই হাজির কিশোর। দুটো গান ছিল। আজ মিলন তিথির পূর্ণিমা চাঁদ, হয়ত আমাকে কারও মনে নেই। দ্রুত রিহার্সাল সেরে নিয়ে সেদিনই দুটো গানের রেকর্ড হয়ে গেল।

প্রতিশোধ ছবিটা দারুণ হিট করেছিল। তার পেছনে বড় অবদান ছিল কিশোরের ওই দুটো গানের। অজয় দাসের সুর বেশ মন ছুঁয়ে গিয়েছিল কিশোরের। তারপর থেকে দুজনের মধ্যে অদ্ভুত একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল। সুখেন দাসের আরও বেশ কয়েকটা ছবির গান গাইলেন কিশোর। প্রায় সব গানই বেশ হিট। কয়েকটা এখানে উল্লেখ করা যাক। আর তো নয় বেশিদিন, এই তো এসেছি আমি, সুখেও কেঁদে ওঠে মন, কী উপহার সাজিয়ে দেব, ওপারে থাকব আমি, আমার এ কণ্ঠ ভরে, চিতাতেই সব শেষ, তুমি মা আমাকে পৃথিবীর এই আলো দেখিয়েছিলে।

এর মধ্যে অমর কণ্টক ছবির একটা গান আলাদা করে উল্লেখ করা দরকার। এই তো জীবন/ হিংসা বিবাদ লোভ ক্ষোভ বিদ্বেষ/ চিতাতেই সব শেষ। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা। অজয় দাসের সুর। ক্যাসেট করে আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিশোর কুমারের ঠিকানায়। রিহার্সালের সময় গানটা গাইতে গাইতে কেঁদে ফেলেন কিশোর কুমার। সেদিনই ছিল রেকর্ডিং। রেকর্ডিংয়ের পর ডাকলেন সুখেন দাসকে। বললেন, এই গানের জন্য আমি টাকা নিতে পারব না। সুখেন দাস জানতে চাইলেন, কেন? কিশোর বললেন, 'আমি জন্মের গান গেয়েছি। এবার মৃত্যুর গানও গাইলাম। এই গানের জন্য আমি কোনও পারিশ্রমিক নিতে পারব না। গানের কথার জবাব নেই। যে শুনবে, সেই কাঁদবে। সত্যি, গৌরীদা গ্রেট।' সুখেন দাস জানালেন, গৌরীদা যখন ক্যান্সারে আক্রান্ত, তখন তিনি এই গান লিখেছিলেন। শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে এল কিশোরের।

একেকটি গানের পারিশ্রমিক ছিল পনেরো হাজার টাকা। সেই সময়ের হিসেবে অঙ্কটা কম নয়। শুধু মাত্র গানটা ভাল লেগেছে বলে এক কথায় ওই টাকা ছেড়ে দেওয়া! এটাও বোধ হয় কিশোর কুমারের পক্ষেই সম্ভব।

স্নিগ্ধ গ্রাম কোলাখাম

মেঘের চিঠি বয়ে বেড়ানো এক খাম। শান্ত, সুন্দর, স্নিগ্ধ গ্রাম— কোলাখাম। হুল্লোড় নেই, আছে অনাবিল শান্তি। এমন নিরালায় অলসভাবে কাটিয়ে দেওয়া যায় কত মুহূর্ত। ফিরে এসে লিখলেন **সুব্রত মণ্ডল**।

স্কুলের পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় তড়িঘড়ি কোলাখাম যাব ঠিক করলাম। জায়গাটার কথা আগেও শুনেছি। কয়েকটা ভিডিও দেখে কিছু প্রাথমিক ধারণাও হয়েছে। আসলে, আমার কাছে পাহাড় মানেই দার্জিলিং নয়। এইসব পাহাড়ি গ্রাম আমাকে আরও বেশি করে টানে।

রাতের ট্রেনে টিকিট পাওয়া বেশ ঝামেলার। নতুন ট্রেন বন্দে ভারত জিন্দাবাদ। রিজার্ভেশন পেতেও সমস্যা হল না। জোগাড় করলাম হিমালয়ান ওডিসির বুকিং। কথা হল কো-ওনার অনিরুদ্ধ সুরের সঙ্গে। সেইমতো কেয়ারটেকার কুমার রাই আমাদের জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ একটা রুমের ব্যবস্থা করলেন। চার দিনের পিকআপ, ড্রপ ও সাইট সিয়িংয়ের জন্য একটা গাড়ি প্যাকেজে করে নিলাম। বিরু তামাং কোলাখামেরই ছেলে। চার দিনের প্যাকেজ ও ১৩ হাজার টাকায় করে দেবে ঠিক হল। বন্দে ভারত দেড়টা নাগাদ এনজিপি পৌঁছাল।

বিরু তামাং স্টেশনেই অপেক্ষা করছিল। ট্রেনের মধ্যেই লাঞ্চ হয়ে গেছিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চেপে বসলাম। গাড়ি তিস্তা ব্যারেজ, গজলডোবা, ডামডিং এমবিওক হয়ে লাভার রাস্তা ধরল। রাস্তায় ডুয়ার্সের জঙ্গল আর বেশ কিছু চা-বাগান চোখে পড়ল। একটু রোদ, একটু মেঘলা, একটা অদ্ভুত ভাল লাগার আবেশ যেন আমাদের ছুঁয়ে যাচ্ছে। এই পাহাড়, জঙ্গলের

সান্নিধ্য সত্যিই মানুষকে অনেক বেশি উদার করে তোলে। কোনও রাগ নেই, বিরক্তি নেই, হতাশা নেই, শুধুই একরাশ ভাল লাগা। লাভা পৌঁছানোর ঠিক আগে নেওড়াভ্যালির ভিতরে চেকপোস্ট ক্রস করে আমরা জঙ্গলের রাস্তা ধরলাম। এখান থেকে কোলাখাম সাত কিলোমিটার রাস্তা। জায়গায় জায়গায় একটু ভাঙাচোরা। কিন্তু আশপাশের রোমাঞ্চ এতটাই যে সেই ভাঙাচোরা রাস্তায় এতটুকুও বিরক্তি এল না।

সন্ধ্যে নামার ঠিক আগে পৌঁছে গেলাম কোলাখাম গ্রামে। এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন হোমস্টে। তার মধ্যে ক্যাসিরো ইন, দ্য নেস্ট, স্টার হলিডেজ, দ্য ট্রেল্‌স এই হোমস্টে গুলো উল্লেখ-যোগ্য। হোমস্টে হিমালয়ান ওডেসির ব্যালকনি থেকে সামনের উপত্যকা চমৎকার দেখা যায়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে সামনের কাঞ্চনজঙ্ঘা কাল দেখা যাবে। এখানে বসে থাকলে মনে হয়, অলসভাবে সময় বয়ে যাক। মনে হয়, আমার আর কোথাও যাওয়ার নেই, কিচ্ছু করার নেই। হোমস্টের ঘরোয়া খাবার আমাদের সত্যিই তৃপ্ত করেছিল। এই যেমন হাতে গড়া রুটি, চিকেন, সবজি, ডাল আলু-পরোটা, চা। বৃষ্টি হলেই আবার এখানে কারেন্ট চলে যায়। হোমস্টের কোনও রুমে টিভি নেই। একদিক থেকে ভালই হয়েছে। নাই বা দেখলাম টিভি। টানা ব্রেকিং নিউজ থেকে অন্তত কয়েকদিনের বিরতি। মেঘ রোদ্দুরের সঙ্গে গল্প করতে করতে কয়েকটা দিন কেটে যাবে। আর লিখব ডায়েরি। সঙ্গী আছে কিছু বই। রাতের খাবার খেয়ে একটু বাইরে এসে দাঁড়ালাম। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে, তার মাঝে ব্যালকনি জুড়ে বিভিন্ন ফুল আর অর্কিডের বাহার অসাধারণ লাগছিল।

পরের দিন আকাশ ভালই ছিল। খুব ভোরে উঠে পড়লাম কিছু ছবি তুলব, আর গ্রাম ছেড়ে পাইন গাছের জঙ্গলের দিকে রাস্তা ধরে কিছুটা দূর হেঁটে আসব বলে। কিছুটা দূরে যেতেই গ্রামের চতুষ্পদেরা আমাদের সঙ্গী হল। যতদূর হেঁটে গেছি ওরা আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। আবার যখন ফিরছি তখনও ওরা সঙ্গেই ছিল। ফিরে এসে বেলার দিকে বেড়িয়ে এলাম লাভা, নোকদাঁড়া,

রিশপ আর টিফিনদাঁড়া ভিউ পয়েন্ট। মূল রাস্তা থেকে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে প্রায় কিলো মিটার খানেক পথ একটা ছোটখাটো ট্রেক হয়ে। আমাদের সঙ্গে ছোট ছেলে ও মেয়েও বেশ উপভোগ করতে লাগল।

রাতে বৃষ্টি নামল। সকালে কিছুটা পরিষ্কার। পৌঁছে গেলাম ছাঙ্গে ফলস। সেখান থেকে উপরে উঠে এসে নেওড়া ভ্যালির ভিতর দিয়ে রাচেলা টপ গেলাম। রাস্তাটা বেশ এবড়ো খেবড়ো। লাভা বাজারের বিজয়কুমার তার বোলেরো গাড়িতে করে আমাদের রাচেলা টপে নিয়ে গেল। উপরে উঠে সম্মোহিতের মতো অনেকক্ষণ কাটালাম। শুধু মেঘ আর কুয়াশা। দূরে পর্বতের দর্শন তাই হল না। লাভা ফিরে এলাম। পথের ধারে লাভা বাজারের মুখে লামু ফুড সেন্টারে গরম গরম ওয়াই ওয়াই, চিকেন মোমো আর নুডলস খেলাম। তারপর গেলাম মনাস্ট্রি। চারটের সময় প্রার্থনা শুরু হল। এই প্রথম মোনাস্ট্রির ভিতর ছোট–বড় নানান বয়সী লামাদের সঙ্গে পুরো প্রার্থনা পর্ব উপভোগ করলাম।

রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। পাশের রুম থেকে কর্ণবিদারক আওয়াজ ভেসে আসছে... ও সাকিরে, সাকিরে সাকি.... বুঝলাম কালরাত্রে যে চারজন মেয়ে এই হোমস্টেতে এসে উঠেছে, তারাই আনন্দ ফুর্তি করছে। রাত্রির নিস্তব্ধতা নির্জনতাকে খানখান করে দিচ্ছিল শহুরে এই মেজাজ। কিছুটা রাগই হচ্ছিল। এরা কেন এই শান্ত গ্রামে আসে। এটা যে হুল্লোড় করার জায়গা নয়, এটুকুও বোঝে না! কাল রাত্রে আরও একজন বয়স্ক কাপল এই হোমস্টেতে এসেছেন। তাঁদের কথা ভেবেও খারাপ লাগছিল। কোলাখাম বিখ্যাত অসংখ্য পাখির গুঞ্জনের জন্য। বোধহয় তারাও এই রাত্রে ঘুমোতে না পেরে বিরক্ত।

ভ্রমণ শেষে পরের দিন পাহাড়জুড়ে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সেরা সঞ্চয় হয়ে থাকবে হোম-স্টের সামনে কুমার রাই ও তার পরিবারের সঙ্গে আমাদের ছবিখানা। অনেক অভিজ্ঞতা আর ভাল লাগার আবেশ নিয়ে ফেরার রাস্তা ধরলাম।

কুয়াশাঘেরা ছোট্ট গ্রাম পাবং

নূপুর রায়

কালিম্পং শহর থেকে মাত্র ২২ কিলোমিটার দূরে ছবির মতো সুন্দর গ্রাম পাবং। গুটি কয়েক ঘর বাড়ি, একটা প্রাইমারি স্কুল, দু চারটে হোম স্টে, দুটো বিলাসবহুল ফার্ম হাউস। এ বাদে এখানে সত্যিই আর দেখার কিছুই নেই। তবে যা আছে তার হল অনাঘ্রাতা, অসামান্যা প্রকৃতি। চারিপাশে ঘিরে থাকা ন্যাওড়া ভ্যালির বিস্তীর্ণ জঙ্গল, কান পাতলেই ভেসে আসা পাখির কূজন আর মেঘের গায়ে লেগে থাকা বুনো ফুলের ঘ্রাণ। এমন একটা জায়গায় দু একদিন কাটিয়ে গেলে এমনিতেই মন ভাল হয়ে যায়।

কুয়াশার ওড়না জড়ানো নীলচে সবুজ পাহাড়, এলাচের ক্ষেত, ঝাড়ু গাছের ক্ষেত চিরে নিকষ কালো একটা পিচের রাস্তা পাকদণ্ডীর মতো উঠে গেছে একেবারে উপরে, ওই সবুজে মোড়া পাহাড়ের মাথায়। ওটাই হল চারখোল।

কালিম্পঙ থেকে পাবং আসার রাস্তাটাও অসাধারণ। মন কেড়ে নেওয়া একান্ত আপনজনের মতো। প্রতি মুহূর্তে ঘন সবুজ বর্ষণস্নাত প্রকৃতি দু'হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করে বলে, এই তো এলে, একটু জিরিয়ে গেলে না হয়।

পথের সৌন্দর্য বড়িয়েছে দুই সহোদরা গ্রাম রেলি আর পলা আর তাদের নিজস্ব দুই নদী। ভরা বর্ষায় ঝমঝমিয়ে পাথর ডিঙিয়ে নেচে নেচে বয়ে চলেছে চপলা বালিকার মতো। খুব ইচ্ছে ছিল পা ডুবিয়ে ওদের সঙ্গে গল্প করি। বলি, আসবো আবার। এই তো চিনে গেলাম। সে আর হয়ে ওঠেনি।

পাবংয়ে আমরা উঠলাম ভট্টরাই হোমস্টে তে।। সম্ভ্রান্ত নেপালী ব্রাহ্মণ পরিবারের নিজস্ব বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া তিনটে ঘরেই পর্যটকদের থাকার

ব্যবস্থা। নিজস্ব ক্ষেত খামার, গোয়ালঘর, কাঠের দোতলা বসত বাড়ি, প্রশস্ত উঠান— সব মিলিয়ে খুব সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশ। পুজো উপলক্ষে শহর থেকে আত্মীয় স্বজন এসেছেন। আর সঙ্গে যোগ দিয়েছি আমরা তিনজন। পুরো বাড়ি জুড়ে উৎসবের আমেজ। খুব সহজেই আমরা এবাড়ির সকলের সঙ্গে মিশে গেলাম।

বাধ সাধলো প্রকৃতি। আগের রাত থেকে যে বৃষ্টিটা শুরু হয়েছে, এখানে এসে তা আরও প্রবল আকার ধারণ করল। টিপ টিপ, রিমঝিম, ঝমঝম কোনও উপমাতেই তাকে আর বেঁধে রাখা গেল না। ছোটবেলায় পরীক্ষায় খুব কমন একটা রচনা ছিল— 'একটি বর্ষণ মুখর দিনের অভিজ্ঞতা'। এর যথার্থতা জীবনের প্রথমবার মন প্রাণ দিয়ে অনুভব করলাম। আর বৃষ্টি একটু ধরতেই ছাতা সম্বল করে সোজা গ্রামের পথে।

প্রকৃত অর্থে গ্রাম বলতে যা বোঝায় এখানে তার রূপ কিছুটা ভিন্ন। পাহাড়ের কোলে অনেক সময় ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে দেশলাই বাক্সের মতো হঠাৎ করে একটা একলা বাড়ি নজরে আসে। এই হোমস্টে-টা অনেকটা তেমনি। বেশ কিছুটা এলাচের ক্ষেত পেরিয়ে আসতে হয়। এরপর ইতস্তত কিছু ঘর বাড়ি, নতুন তৈরি হচ্ছে এমন কিছু হোমস্টে, আর তার পর একটা প্রাইমারি স্কুল। উপরে ওঠার পথে রয়েছে অত্যাধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন কিছু ফার্ম স্টে। পাবং থেকে চার কিলোমিটার হেঁটে চারখোল গিয়ে ফিরে আসা যায়। আবহাওয়া প্রতিকূল থাকায় আমরা সেভাবে যাইনি।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে পৌঁছোলাম প্রাইমারি স্কুলের প্রাঙ্গণে। সেখানেই দুর্গা পুজোর আয়োজন হয়েছে। সারা গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে আনন্দ করছে। আমরাও সেই উৎসবে সামিল হলাম। পুজো শেষে প্রসাদ খেয়ে টিকা লাগিয়ে ফিরতে না ফিরতেই আবার আরেক প্রস্থ বৃষ্টি। তারপর এল সেই মায়াবী সন্ধে। একটা একটা করে দূরের পাহাড়ে জ্বলে উঠল আলো। বিন্দু বিন্দু সেই আলোগুলো জুড়ে গিয়ে তৈরি হল আলোর মালার। হিরের নেকলেসের মতো দ্যুতি ছড়ালো মেঘের গায়ে। এক সুতোয় বাঁধা পড়ল দূরপিন দাঁড়া, কালিম্পং, আলাগড়া থেকে সুদূর ভূটানের কিছু অংশ।

দূরের পাহাড়ের আলো দেখার সৌভাগ্য আগে হলেও, এত সুন্দর নির্দিষ্ট আকৃতি আগে কখনও দেখিনি। আবারও মুগ্ধ হলাম। কিছু মুহূর্ত লেন্সবন্দি হল। যা চর্মচক্ষে দেখতে পাইনি তা মানসচক্ষে কল্পনা করে নিলাম। আফসোস একটাই, আবহাওয়া ভাল থাকলে এ বাড়ির উঠান কিংবা জানালা থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা– সহ হিমালয়ের একটা বিস্তৃত রেঞ্জ দেখা যায়। কিন্তু আমরা তা দেখতে পাইনি।

খাওয়ার টেবিলে কথায় কথায় গল্প জমে উঠল। কার্শিয়াং থেকে এবাড়িতে পুজো উপলক্ষ্যে এসেছেন কাকু –কাকিমা। দু'জনই অধ্যাপক। ভাল বাংলা জানেন। ওনাদের কাছ থেকেই জানলাম পাহাড়ের শিক্ষা ব্যবস্থা, চাকরি–সহ বিভিন্ন সমস্যার কথা। জানলাম এই পাবং এর কথা। ১৯২০ সালে দূরপিন দাঁড়াতে আর্মি ক্যাম্প তৈরি হলে ওখানকার জনবসতিকে পাবং ও কাফের গাঁও তে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। ওনারা সেই ভাবেই এখানে এসেছেন। কাকু নিজে হাতে নতুন স্বাদের খাসির মাংস রান্না করে খাওয়ালেন। এই মাংস দু'দিন ধরে সংরক্ষিত হয়েছে কাঠের উনুনের তাপে, ফলে একটা আনকমন ফ্লেভার ছিল। খাওয়ালেন নিজের হাতে তৈরি স্পেশাল পান, মিষ্টি আরও কতকিছু। বলাবাহুল্য, এগুলোর কোনওটাই আমাদের প্রাপ্য পরিষেবার আন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিছু মানুষ এভাবেই মনের কাছাকাছি চলে আসেন। পরের দিন এই ভালোলাগাটুকু সঙ্গে নিয়েই চলে যাব চারখোল। ওখানেই কাটিয়ে আসব বাকি দুটো দিন।

শান্ত গ্রাম বারমিক

কুয়াশাঘেরা জোড়পোখরি

রুমা ব্যানার্জি

শহুরে একঘেয়েমিতে ক্লান্তজীবন যখন প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিতে চায়, তখন মন ছুটে যায় নীল সবুজ হিমালয়ের কোলে কোনও অজানা গ্রামে। সেখানকার সোঁদা মাটির গন্ধ, ঝোপে ঝাড়ে ঝিঁঝি পোকার ডাক, হোমস্টের রান্নাঘর থেকে নেপালি সুরে গুনগুন, দূরে পাহাড়ের গায়ে জ্বলে থাকা টিমটিমে আলো — সব যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। কিছুটা নিমরাজি কর্তাকে বাগে পেয়ে বললেই ফেললাম, চলো কদিন পাহাড়ে ঘুরে আসি। হাতে বেশিদিন ছুটি নেই, বড়জোর চার– পাঁচ দিন। তাই বা মন্দ কী? কর্তা রাজি, শুধু শর্ত একটাই, দার্জিলিঙে থাকা চলবে না। অগত্যা তাতেই রাজি।

আগে থেকে তেমন প্ল্যান ছিল না। তাই বন্ধুর শরণাপন্ন হলাম। সে ফোন করে একটা মনের

মতো হোমস্টেও খুঁজে দিল, শহর থেকে দূরে, যেমনটি চাইছিলাম। বারমিক, কালিম্পং এর কাছে একটা নির্জন গ্রামে। গাড়িও ঠিক হল। এন জে পি থেকে তুলে নেবে। চালাও পানসি বেলঘরিয়া!

ভোরবেলায় দার্জিলিং মেল থেকে নেমে বাক্স পেঁটরা নিয়ে চড়ে বসলাম নির্দিষ্ট গাড়িতে। শহর ছাড়িয়ে একটু প্রাতরাশ, তার পর সেবক রোড ধরে সোজা বেঙ্গল সাফারি। আমার বন্য জীবজন্তু দেখার দৌড় চিড়িয়াখানা পর্যন্ত। খোলা পরিবেশে, সতর্ক পাহারায় দক্ষিণরায়কে দেখা এই প্রথম, তাও একহাত দূরত্বে। বানর, হাতি, হরিণ, ভাল্লুক, ময়ূর সব দেখার পরে দর্শন দিলেন স্বয়ং দক্ষিণরায়। অলস পায়ে, ঘাড় ঘুড়িয়ে, তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে হেঁটে চলে গেলেন সামনে দিয়ে। মন বলল, মহারাজা তোমাকে সেলাম।

সন্ধ্যা নামার মুখে পৌঁছে গেলাম বারমিক, পাহাড়ের ঢালে একটা ছোট্ট গ্রাম। ছড়ানো-ছেটানো কিছু বাড়ি। কালিম্পং থেকে রংপো যাওয়ার যে পাকা রাস্তা গ্রাম চিরে চলে গেছে, তার ধারে গোটা চার-পাঁচ দোকান। নিচে, অনেকটা নিচে খানিকটা সমানমতো জায়গায় একটা খেলার মাঠ। পাশে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় আরেকটা ঝরনা আছে গ্রামের গা-ঘেঁষে। অনেকখানি পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে একটা চওড়া পাথরের ওপর পড়ছে। সেখান থেকে প্লাস্টিকের বোতলে বা জারিকেনে ভরে জল আনে গ্রামের লোকেরা। সেটাই বলতে গেলে বারমিকের খাওয়ার জল। বাকিটা বৃষ্টির জল ধরে রেখে। পর্যটক এলে জলের গাড়ি বুক করতে হয়। পথচলতি ড্রাইভাররা অনেক সময় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ঝরনা থেকে তাদের বোতলে জল ভরে নেয়। এসব নিয়েই এই গ্রাম। মালিক বেশ

আন্তরিকভাবে হাসি মুখে আমাদের স্বাগত জানালেন। ছোট্ট ছিম ছাম অথচ আধুনিক ব্যবস্থাযুক্ত বাড়ি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে যতদূরে চোখ যায়, শুধু সবুজ। মালকিনের হাতের রান্না সব ক্লান্তি ভুলিয়ে দিল। সেদিন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। কারণ, পরের দিন কালিম্পং যাব।

কালিম্পং তিস্তা নদীর ধারে একটি শৈলশিরার উপর অবস্থিত। এমনিতে শহরটা বেশ ঘিঞ্জি। তবে দর্শনীয় স্থান অনেক। শহরের কাছেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত গৌরীপুর হাউজ। কালিম্পংয়ের আরেক দ্রষ্টব্য লেপচা মিউজিয়াম। এই শহরে বেশ কয়েকটি বৌদ্ধ মঠ, চার্চ অতিমারির কারণে বন্ধ। বিখ্যাত মর্গ্যান সাহেবের বাংলো সেটাও বন্ধ। আসলে, যাদের বুকিং থাকে, শুধু তাদের জন্যই খোলা। সামনেই একটা মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট। সেখানে ক্যাফেটোরিয়ায় বসলেই মন জুড়িয়ে যায়। যতদূর চোখ যাবে, গলফ কোর্স। এখানে কত যে সিনেমার শুটিং হয়েছে! এই মর্গ্যান হাউসেরও একটা ঐতিহ্য আছে। হন্টেজ হাউস খুঁজলেই একেবারে শুরুতে এসে যায় এই বাংলোর নাম। সাহেবি আমলের বাংলো। এখন পর্যটন দপ্তরের অধীনে। ভেতরটা নাকি অত্যাধুনিক, কিন্তু বাইরে দিকের আদলটা ইচ্ছে করেই ভুতুড়ে রাখা হয়েছে। কাছেই দূরপিন মনেস্ট্রি। ওখানে গেলেই মনে অদ্ভুত একটা প্রশান্তি আসে। দারুণ একটা ভিউ পয়েন্ট রয়েছে।

ক্যাকটাসের মনোমুগ্ধকর সংগ্রহ দেখতে গেলাম, পাইন ভিউ নার্সারিতে। এছাড়া হনুমান পার্ক, দুর্গামন্দির, কালীমাতা মন্দির প্রভৃতি জায়গা দেখার মতো। তিস্তা বাজারে মংপুর রেস্টুরেন্টে খেয়ে পেট মন দুটোই ভরল। এখনও মোমোর সুবাস পাচ্ছি যেন।
পরেরদিন দার্জিলিং, আমার স্বপ্নের শহর, দার্জিলিং। নীল আকাশের নীচে পাহাড়ের গায়ে ধূসর মেঘেদের আনাগোনা, সবুজ উপত্যকার গায়ে ছোট ছোট কাঠের বাড়ি, আর পাইন, দেবদারুর সাথে রডোড্রেনড্রন,

ক্যামেলিয়ার মেলবন্ধন ভ্রমণপ্রেমীদের বার বার টেনে নিয়ে যায় দার্জিলিং। মেঘ–কুয়াশার লুকোচুরিতে ব্যস্ত শহরের পাশ দিয়ে চলে যায় টয় ট্রেন। পাইনের অন্ধকার মাখা পিস প্যাগোডা যাওয়ার রাস্তা আমাকে বড্ড আর্কষণ করে। ভিউ পয়েন্টের রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে বারবার হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে কুয়াশায়, মেঘেদের ভিড়ে। গ্লেনারিজ আর ম্যাল ঘুরে তীর্থ করার আনন্দ নিয়ে রওনা হলাম। শর্ত অনুযায়ী দার্জিলিংয়ে থাকা হবে না। সুতরাং ঠিক হল থাকব কিছুটা দূরে, জোড় পোখরিতে।

জোড় পোখরি, হিমালয়ের কোলে পাইন আর ধুপি গাছের জঙ্গলে ঘেরা, কুয়াশা মাখা একটা ছোট্ট জায়গা প্রায় ৭৬০০ ফুট ওপরে, সেঞ্চল অভয়ারণ্যের একটা অংশ। এখন একদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে এমন। অন্যদিকে কার্শিয়াং আর দার্জিলিং।

দার্জিলিং ঘুরে রওনা হলাম জোর পোখরির উদ্দেশ্যে। চড়াই উতরাই পেরিয়ে মাত্র ১৯ কিমি রাস্তা। সান্দাকফু যাওয়ার জন্য মানেভঞ্জন বা চিত্রের দিকে না গিয়ে ধরলাম সুখিয়া পোখরির পথ। শুনশান রাস্তা, পাইন গাছের পাতা ঘেঁসে হওয়ায় বাজছে এক নৈসর্গিক সুর, দিনের শেষ তাই পাখির কূজনে পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ছে মায়াবী সুরের ঝর্না, পথে রয়েছে কংক্রিটের তৈরি বেঞ্চ যেখানে বসে এই আনন্দ উপভোগ করা যায়।

সন্ধ্যা নামছিল পাইনের পাতা বেয়ে। কুয়াশা আর মেঘ চপল কিশোরীর মতো পথের আঁকে বাঁকে খেলা করছে দল বেঁধে। কান পাতলেন শোনা যায়, গাছ থেকে টুপ টাপ করে ঝরছে জলের ফোঁটা। আমাদের ড্রাইভার জানালো সামনেই একটা গোরস্থান, সব মিলিয়ে একটা গা শিরশিরে অনুভূতি ঘিরে ধরল।
যতক্ষণে আমরা হোমস্টেতে পৌঁছোলাম, ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমেছে। যদিও ঘড়িতে সময় সাড়ে পাঁচটা। দূরে কার্শিয়াং শহর জুড়ে আলো জ্বলছে। এমনকী বাগডোগরার আলো পর্যন্ত দেখা গেল।

হাতে গরম ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে যেন হারিয়ে যাচ্ছিলাম স্বপ্নের রূপকথার রাজ্যে। সব যেন ঘুমিয়ে আছে রুপোর কাঠির ছোঁয়ায়। যদিও ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমি নেই, তবে শুনলাম ওখানে হিমালয়ের স্যালামান্ডার দেখা যায়। যার আঞ্চলিক নাম গোড়া এবং বেশ কিছু বছর আগে ভাল্লুক দেখা গেলেও এখন আর তেমন বন্যপ্রাণী দেখা যায় না। নিশ্চিন্তে ঘরে ঢুকে পড়লাম।

সুন্দর সাজানো গোছানো ঘর, বড় বড় জানালার পর্দা সরালেই সামনেই দুটো পুকুর, এই জোড়া হ্রদের জন্যই জায়গার নাম জোড় পোখরি। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় এতটাই ঠান্ডা লাগছিল যে রুমহিটার নিতে হল। গরম গরম খাবার খেয়ে আমরা সে দিনের মতো যে যার ঘরে লেপ কম্বলের মধ্যে সিঁধিয়ে গেলাম। খুব ভোরে ঘুম ভাঙল। ঝকঝকে আকাশ আর সামনে অপরূপা কাঞ্চনজঙ্ঘা তার মোহিনী রূপে মাথায় সোনার মুকুট পরে উপস্থিত। সে দৃশ্য বর্ণনা করার ক্ষমতা ঈশ্বর আমাকে দেননি, শুধুই মুগ্ধতায় ঈশ্বরের এই অসীম দান প্রাণ ভরে গ্রহণ করলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ না যেতেই নেমে এল মেঘমালা, ঢেকে দিল আশপাশ। একটু আগের রূপের সঙ্গে কোনও মিল নেই এই কুয়াশা ভরা সকালের। দিন যত বাড়ল, কুয়াশা ততই ঘন হতে লাগল। সামনের শান বাঁধানো পুকুর একটা বিরাট সাপের মূর্তি যেন এই কুয়াশায় কেমন জীবন্ত মনে হচ্ছিল। জ্বলে সাঁতার কাটছে বেশ কিছু হাঁস, দূরের বাগানটায় চরে বেড়াচ্ছে আরও কতগুলো। পুকুর দুটি ঘিরে যত্নে লালিত মরশুমে ফুলের সারি আর তারপর সীমানা প্রাচীরের মত পাইন গাছের সারি, এক অসামান্য মেল বন্ধনে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম।

মিরিকের পথ ধরে নিলে ফিরতে সময় লাগার কথা সাড়ে তিন ঘন্টা। তাই সকালটা ঘুরলাম চারিদিকে। আমি তখনও আমার চাতক মনটাকে ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে। ফেরার সময় নেপাল বর্ডারের এর কাছে পশুপতি মার্কেটে ঘোরা হল না, কারণ আতিমারির কারণে প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু তাতে দুঃখও নেই, যে দৃশ্য মন ভরে দেখেছি সেটা ফিরে অনেক দিন অক্সিজেন দেবে, বেড়ানোর এটাও একটা সুখ যে ঘুরে এসে সেই সুখ স্মৃতিকে মনে করে ঘটনার জাবর কেটে প্রতিটা মুহূর্ত আবার নতুন করে স্মৃতি পটে ফুটিয়ে তোলার আনন্দই আলাদা।

দর্পচূর্ণ

বেঙ্গল টাইমস

৮ জুন, ২০২৪

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in